# ফজিলাতুন্নেসা : ঢাকা  বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী / আফরোজা পারভীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসা । মুসলিম মেয়েদের মধ্যে ফজিলাতুন্নেসাই প্রথম স্নাতক ডিগ্রিধারী। তাঁর আগে আর কোনো মুসলমান মেয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেননি। তাছাড়াও দেশের প্রথম নারী অধ্যক্ষ তিনি। ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন।

ফজিলাতুন্নেসা ১৯০৫ সালে (জন্ম তারিখ জানা যায়নি) ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমান টাঙ্গাইল) করটিয়ার 'নামদার কুমুল্লী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওয়াহেদ আলী খাঁ, মাতা হালিমা খাতুন। ওয়াজেদ আলী খাঁ মাইনর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। স্কুল শিক্ষক হওয়ার আগে করোটিয়ার জমিদার বাড়িতে চাকরি করতেন তিনি।

ফজিলাতুন্নেসার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে গ্রামে। গ্রামের স্কুলেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ৬ বছর বয়সে ফজিলাতুন্নেসা করটিয়ার প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। শৈশব হতেই ফজিলাতুন্নেসা লেখাপড়ায় আগ্রহী এবং মেধাবী ছিলেন। তিনি প্রতিটি ক্লাসে প্রথম হতেন। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল দেখে পারিবারিক অস্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ওয়াহেদ আলী মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হন। ঢাকায় রেখে মেয়েকে পড়ানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি ওয়াহেদ আলী খাঁনের ছিল না কিন্তু ছিল মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর প্রবল ইচ্ছে। তাই মাইনর পাস শেষে সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধা অতিক্রম করে ১৯১৭ সালে ফজিলাতুন্নেসাকে ঢাকা নিয়ে আসেন তিনি। সে সময়ের একমাত্র সরকারী বালিকা বিদ্যালয় ইডেন স্কুলে ভর্তি করে দেন।  ফজিলাতুন্নেসার যেমন ছিল মেধা তেমনই ছিল বন্ধুর পথ ডিঙানোর মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা। লক্ষ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি লেখাপড়ায় গভীরভাবে মনোনবিশে করেন। কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পুরস্কার তিনি পান। ১৯২১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক ১৫ টাকা হারে বৃত্তি পান। তখন থেকে লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৩ সালে ইডেন কলেজ থেকে আই.এ পাশ করে শিক্ষাবৃত্তি লাভ করেন তিনি। তারপর কলকাতার বেথুন কলেজে বিএ পড়ার জন্য যান। এই কলেজে তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলিম ছাত্রী । ১৯২৫ সালে

ডিসটিংশানসহ বিএ পাশ করেন ফজিলাতুন্নেসা। তাঁর আগে কোন মুসলিম মেয়ে এই বিরল সম্মানের অধিকারী হয়নি।

বিএ পাশ করে তিনি ঢাকা ফিরে আসেন। পিতা তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতে মাস্টার্স ক্লাশে ভর্তি করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি কঠিন পরীক্ষায় পড়লেন। কারণ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার পরিবেশ ছিল না। তিনি নিজ গুণে সতীর্থদের সাথে বন্ধুত্বময় সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে মিশ্র বিভাগে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর এই ফলাফল সবাইকে বিস্মিত করে। এমএ পাশ করার পর ১৯২৮ সালে কিছুদিন তিনি ঢাকার ইডেন স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ফজিলাতুন্নেসা ইংল্যান্ড যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে একজন মেয়েকে বিলেত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি নিজ চেষ্টায় ষ্টেটস স্কলারশীপ যোগাড় করেন। এ ব্যাপারে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও খান বাহাদুর আবদুল লতিফ তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। ফলে তাঁর বিলেত যাওয়ার পথ সুগম হয়। কিন্তু বাবার অসুখের খবর পেয়ে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোর্স শেষ না করেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। এরপর তাঁর আর বিলেত যাওয়া হয়নি। লন্ডন থেকে ফিরে ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতায় যান। প্রথমে স্কুল ইন্সপেক্টরের চাকুরিতে যোগদান করেন। পরে কলকাতার বেথুন কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি এ কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান এবং একই সঙ্গে কলেজের উপাধ্যক্ষা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি বেথুন কলেজের চাকরি ছেড়ে স্বেচ্ছায় ঢাকা চলে আসেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, ইচ্ছে করলেই তিনি কলকাতা থেকে যেতে পারতেন। বেথুন কলেজের মতো একটা নামকরা কলেজের উপাধ্যক্ষের চাকরি ছেড়ে তিনি ঢাকায় ফেরেন দেশের প্রতি প্রবল ভালবাসার টানে। আর এই ভালবাসার টানেই তিনি নিশ্চিত জীবন ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ান।

ঢাকায় ফিরে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন তিনি। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম নারী অধ্যক্ষ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ইডেন কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। বেগম ফজিলাতুন্নেসার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগসহ ইডেন কলেজ ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু প্রশাসনিক কোন্দলের জের ধরে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হয়।

দেশপ্রেমিক ছিলেন ফজিলাতুন্নেসা। অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। ১৯৫২ সালে ইডেন কলেজের মেয়েরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কলেজের অভ্যন্তর থেকে মিছিল বের করার প্রস্তুতি নিলে উর্দুভাষী এক দারোগা হোস্টেলে ঢুকে মেয়েদের ভয়ভীতি দেখাতে শুরু করে। এক পর্যায়ে খবর পেয়ে বেগম ফজিলাতুন্নেসা কলেজে এসে তাঁর বিনা অনুমতিতে কলেজ প্রাঙ্গণে ঢোকার জন্য দারোগাকে ভর্ৎসনা করে নিজের দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে হোস্টেল থেকে বের করে দেন (চ্যাম্পস টোয়েন্টিওয়ান ডটকম ও উইকিপিডিয়া) । এর পেছনে ছিল তাঁর গভীর ভাষাপ্রেম।

ব্যক্তিগত জীবনে খান বাহাদুর আহসানউল্লাহর পুত্র প্রথম বাঙালি সলিসিটর শামসুজ্জোহার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ফজিলাতুন্নেসা। বিলেতে থাকাকালে তাঁদের পরিচয় হয়। পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খার মধ্যস্থতায় শামসুজ্জোহার সাথে ফজিলতুন্নেসার বিয়ে হয়।

ফজিলাতুন্নেসা শুধু অসামান্য মেধাবীই ছিলেন না, ছিলেন অকুতোভয়। বাংলার রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে ভ্রুকুটি করে বোরখা ছাড়া জনসমক্ষে চলাফেরা করতেন তিনি। এজন্য তাঁকে হতে হয়েছিল অদম্য। উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। সাথে ছিল কুসংস্কারবিরোধী মনোভাব। তাই বোরখা পরাকে কখনই তিনি বাধ্যমূলক বলে মেনে নিতে পারেননি। বোরখা না পরার জন্য তিনি বহুবিধ অত্যাচার সহ্য করেছেন। আর শত বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি উওরসূরী মুসলিম মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করে গেছেন।

নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি সম্পর্কে সওগাতসহ অনেক পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গল্প লিখতেন তিনি। 'সওগাত' ও 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোর মধ্যে আছে -মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ, মুসলিম নারীর মুক্তি ইত্যাদি প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা।

ফজিলাতুন্নেসার পরিচয় পাওয়া যায় ড. কাজী মোতাহার হোসেনের লেখা থেকে। তাঁর ভাষায় "তিনি( ফজিলাতুন্নেসা) বীণানন্দিত মঞ্জুভাষিণী ছিলেন না। ছিলেন একজন উঁচুদরের কাকপটু মেয়ে।"

১৯২৮ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় দফা ঢাকা সফরের সময় ফজিলতুন্নেসার সাথে নজরুলের পরিচয় ঘটে। তিনি সংগঠনটির সম্পাদক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের বর্ধমান হাউসের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেণ। ফজিলতুন্নেসা তখন ঢাকার দেওয়ান বাজারস্থ 'হাসিনা মঞ্জিলে' থাকতেন। কাজী মোতাহার হোসেনের কাছ থেকে ফজিলাতুন্নেসা জানতে পারেন, নজরুল হাত দেখে ভাগ্য বলতে পারেন।

ফজিলতুন্নেসারও তাঁর হাত নজরুলকে দেখাবার ইচ্ছা হয়। এভাবে ফজিলতুন্নেসা ও তাঁর বোন সফীকুননেসার সাথে নজরুলের পরিচয় ঘটে ফজিলতুন্নেসার বাসায়। কাজী মোতাহার হোসেনের লেখা থেকে জানা যায়, এরপর কোনো একদিন রাতে নজরুল একাই ফজিলাতুন্নেসার বাড়িতে যান এবং প্রেম নিবেদন করেন। ফজিলতুন্নেসা নজরুলের নিবেদন কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। কলকাতা ফিরে নজরুল ফজিলাতুন্নেসা নিয়ে একটি কবিতা লেখেন। সেই কবিতার নাম প্রথমে 'রহস্যময়ী' ছিল। পরে নাম দেয়া হয় 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ'

তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক
সেদিন যে জ্বলেছিল দীপালী-আলোক
তোমার দেউল জুড়ে ভুল তাহা ভুল
সেদিন ফুটিয়াছিল ভূল করে ফুল।
(তুমি মোরে ভুলিয়াছ)

নজরুল ফজিলতুন্নেসার বিলেত গমন উপলক্ষে ''বর্ষা-বিদায়" নামে একটি কবিতা লেখেন।

ওগো বাদলের পরী!
যাবে কোন দূরে ঘাটে বাঁধা তব
কেতকী পাতার তরী
ওগো ও ক্ষণিকায়, পূব অভিসার
ফুরাল কি আজ তব?
পহিল ভাদরে পড়িয়াছে মনে
কোন দেশ অভিনব!
(বর্ষা-বিদায় )

নজরুল ও ফজিলাতুন্নেসা সংক্রান্ত মোট ৮টি চিঠি এ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি ড. কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা ও ১টি চিঠি ফজিলাতুন্নেসাকে লেখা। তবে মোতাহার হোসনকে লেখা চিঠিগুলো ফজিলাতুন্নেসা পড়ুক এমন আগ্রহ নজরুলের ছিল। চিঠিতে তা উল্লেখ থাকতো! 'এ চিঠি শুধু তোমার এবং আরেকজনের। আরেকজনকে দিও এ চিঠিটা দুদিনের জন্য'।

ফজিলাতুন্নেসার সরাসরি প্রত্যাখ্যানে নজরুল তাঁকে চিঠি লেখার সাহস হারিয়েছিলেন। তারপরও দীর্ঘদিন বন্ধু মোতাহার হোসেনের কোনো খবর পাচ্ছেন না এই অছিলায় একটি পত্র লেখেন। এ চিঠি নজরুল লিখেছিলেন অত্যন্ত কুণ্ঠার সাথে। তিনি ফজিলাতুন্নেসাকে চিঠিতে 'আপনি' সম্বোধন করেছিলেন। লিখেছিলেন, 'আপনি যদি দয়া করিয়া, জানা থাকিলে আজই দুই লাইন লিখিয়া তাহার খবর জানান, তাহা হইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব'। ফজিলাতুন্নেসা তাঁকে দয়া করেছিলেন বা এ চিঠির কোনো উত্তর দিয়েছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। নজরুল তাঁর নির্বাচিত কবিতা সংকলন 'সঞ্চিতা' ফজিলাতুন্নেসাকে উৎসর্গ করার কথা এ চিঠিতে লিখেছিলেন। কিন্তু নজরুল পরে সঞ্চিতা

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, বই উৎসর্গের অনুমতি ফজিলাতুন্নেসার কাছ থেকে নজরুল পাননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান নলিনীবোসের প্রিয় ছাত্রী ছিলেন ফজিলাতুন্নেসা। এই মেধাবী, অধ্যবসায়ী ও লড়াকু ছাত্রীটির প্রতি তার ছিল বিশেষ দৃষ্টি। ছাত্রীটি যাতে বয়সসুলভ চপলতায় কোনো ভুল না করে বসে এ বিষয়ে তিনি তাঁকে সবসময় সজাগ করতেন।
ফজিলাতুন্নেসার কাছে এই শিক্ষকের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। অনেকটা দেবতার মতো।
নজরুলের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ-এ ফজিলাতুন্নেসা তাঁর এই শিক্ষকের বিষয়ে সোৎসাহে বলেছিলেন। শিক্ষকের প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধাবোধকে নজরুল ধরে নিয়েছিলেন শিক্ষকের প্রতি দুর্বলতা হিসেবে। ফজিলাতুন্নেসা তাঁকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলে নজরুল এই শিক্ষককে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। তাই ফজিলাতুন্নেসার প্রতি সব অভিমান কবি ঝেড়েছেন গণিতের উপর। কবির ভাষায় 'কোনো নারী, সুন্দরের উপাসিকা নারী, কোনো অঙ্কশাস্ত্রীর কবলে পড়েছে, এ আমি সইতে পারি নে। নারী হবে সুন্দরের অঙ্কলক্ষী, সে অঙ্কশাস্ত্রের ভাঁড়ার রক্ষী হবে কেন?'
অপর একটি চিঠিতে কবির উতলাভাব আরও প্রকট হয়েছে, 'আমার এতদিনে ভারী ইচ্ছে করছে অঙ্ক শিখতে। আমি যদি বিএ-টা পাশ করে রাখতাম, তাহলে দেখিয়ে দিতাম যে, এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট কবিও হতে পারে ইচ্ছে করলে।'
ফজিলাতুন্নেসাকে না পাবার বেদনা দু'তিনবছর নজরুলকে আলোড়িত করলেও ফজিলাতুন্নেসার বিলেত গমনের পর ক্রমশ তিনি তাঁকে ভুলে যান।
কাজী মোতাহার হোসেন লেখেন, "ফজিলতের প্রতি নজরুলের অনুভূতির তীব্রতা দু'তিন বছরের সময়-সীমায় নিঃশেষিত হয়ে যায়।"

১৯৩০ সালের আগস্টে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ- সেবক-সংঘে'র বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যটি নারী জাগরণের মাইলফলক হয়ে আছে। এই অধিবেশনে তিনি বলেন 'নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন ও বলেন। নারী সমাজের অর্ধাঙ্গ, সমাজের পূর্ণতালাভ কোনোদিনই নারীকে বাদ দিয়ে সম্ভব হতে পারে না। সেই জন্যেই আজ এ সমাজ এতোটা পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন, এ সমাজের অবনতির প্রধান কারণ নারীকে ঘরে বন্দি করে রেখে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখা। নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে এতোটা কথা আজ বলছি তার কারণ সমাজের গোড়ায় যে-গলদ রয়েছে সেটাকে দূরীভূত করতে না-পারলে সমাজকে কখনই সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারা যাবে না।'

ফজিলাতুন্নেসা জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন নিঃসঙ্গ নির্জনে। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, বর্তমান প্রজন্ম তাঁকে খুব একটা জানে না। ফজিলতুন্নেসাকে তেমনভাবে স্মরণও করা হয় না। ১৯৭৬ সালের ২১ অক্টোবর ফজিলতুন্নেসা মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭ সালে তাঁর নামে একটি হলের  নামকরণ করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১। উইকিপিডিয়া
২। নজরুলের পাত্রবলী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ৫ম সংস্করণ, ২০১৮ সাল।
৩। ফজিলাতুন্নেসা: স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রথম মুসলিম বাঙালি নারী, চ্যাম্পস টোয়েন্টিওয়ান ডটকম, ডিসেম্বর ১১, ২০১৯।
৪ ।নজরুলের অসম্পূর্ণ প্রেম, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, দৈনিক প্রথম আলো আগস্ট ৩০,২০১৭।